সূচিপত্র

আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি / ১৩
বংশ তালিকা / ২৪১
বিশ্ব সাহিত্য বনাম অ্যানার ডায়েরি / ২৫৩
গুপ্তমহলের বাসিন্দা / ২৬৩
ডায়েরি প্রকাশের নেপথ্যে / ৩৪১
ডায়েরি প্রকাশের পরে / ৩৪৯
যাঁরা অ্যানা আলোকে উদ্ভাসিত / ৩৫৩
আলোকচিত্র / ৩৬৩
পরিশিষ্ট / ৩৭৩

জানা-অজানা

অ্যানা ফ্রাঙ্ক

তপেন্দ্রকুমার পাল

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত
আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি
সম্বলিত

পুনশ্চ

॥ কৈফিয়ৎ ॥

এত বিষয় থাকতে কেন অ্যানা-কে বেছে নিলাম? পাঠক অবশ্যই কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারেন।

অ্যানার ডায়েরি বিক্রির সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে গেছে বহুদিন আগেই। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ৭২টি ভাষায় তাঁর দিনলিপি অনুদিত হয়েছে। স্মরণীয় কালের মধ্যে এমন ঘটনা দ্বিতীয়টি ঘটেনি যার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। এমন ঘটনা মানে স্রেফ ডায়েরি লিখে বিখ্যাত হওয়া। এগুলি অন্যতম কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়।

অ্যানা অতি সাধারণ ফ্রাঙ্ক পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যা। স্বভাবে দুষ্টু-মিষ্টি, একটু বেশি কথা বলতে ভালোবাসে। তার এই স্বভাবের জন্য স্কুলে একাধিকবার শাস্তিও জুটেছে। তাতেও তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পাড়ার ও স্কুলের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই শৈশব কাটিয়েছে। আগামী দিনে সে-যে বিরাট মাপের কেউ হবে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তাহলে কোন যাদুবলে অ্যানা অতি সাধারণ তৃণ থেকে এমন অভ্রভেদী মহীরূহ হয়ে উঠল। ডায়েরি-তে কী এমন লেখা আছে যা বিশ্বের এত কোটি মানুষকে এভাবে মোহিত করল?

একদিন তাঁর লেখা অটো ফ্রাঙ্ক সম্পাদিত 'ডায়েরি অব এ ইয়ং গার্ল' পড়ে ফেললাম। অতি সাধারণ সহজ ভাষায় লেখা দিনলিপি। মনের কথা, প্রাণের কথা উগরে দিয়েছে তার আদরের কিটি (ডায়েরি-র ডাকনাম)-র কাছে। গুপ্তমহলের বাসিন্দাদের সম্পর্কে তাঁর খিটিমিটি, নাৎসিদের অত্যাচার, দার্শনিক চিন্তা সবই ঠাঁই পেয়েছে তাঁর ডায়েরিতে। সমসাময়িক যে কোনো ডায়েরি খোঁজ করলে এমন কথাই থাকবে। তাহলে অ্যানার ডায়েরির বিশেষ বৈশিষ্ট কী? এক কথায় ডঃ জ্যান রোমেন বলেছেন, ন্যুরেমবার্গের সমস্ত নথি ইহুদি অত্যাচারের সম্পর্কে যত তথ্য দিতে পারে এক অ্যানার ডায়েরি তার চেয়ে বেশি সক্ষম।

সত্যিই তাই। বিন্দুমাত্র অতিকথন নয়। সাধারণ কথার ফাঁকে-ফাঁকে যে চিত্রটা ধরা পড়ে তা পাঠককে সেই ভয়াবহ দিনের কথা শুধু স্মরণ করায় না, অনুভব করাতে বাধ্য করে। নাৎসিদের দ্বারা কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল বিশেষ করে ইহুদিদের। ছয় মিলিয়ন শুধু ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল অসীম কষ্ট দিয়ে। অ্যানা-র ডায়েরি যেন তারই এক দলিল।

এই ডায়েরি পড়ার পর থেকেই ব্যক্তি অ্যানা সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মায়। কেমন ছিল তাঁর ছোট্ট জীবন, বিশেষত শেষের দিনগুলো যা আজও রহস্যের অন্ধকার

দিয়ে মোড়া। কেমন ছিল তাঁর পরিমণ্ডল, বিশেষ করে গুপ্তমহলের বাসিন্দারা। ভাগ্যদেবতা কার ললাটে কী লিখেছিলেন? সবই জানার ইচ্ছে অঙ্কুরিত হয়ে মনের গোপনেই বৃদ্ধিলাভ করছিল। সুযোগ এসে গেল ইউরোপ ভ্রমণের। নিছক ভ্রমণবিলাসী হিসাবে নয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যন্ত এলাকা দেখার। দূর পথ ট্রেনে বা বাসে পাড়ি দিয়ে বাকিটা সাইকেল নিয়ে ঘুরতাম। ফলে নিবিড় ভাবে দেখার সুযোগ হত। এভাবেই অ্যানা-স্মৃতিবাহী প্রায় সমস্ত স্থান পরিদর্শন করেছি। সুযোগ মতো তথ্য সংগ্রহ করেছি। অ্যানার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত প্রায় সবাই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ভিন লোকে পাড়ি দিয়েছে। যারা আছে তারাও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে।

প্রথমে ভেবেছিলাম 'সাইকেলে ইউরোপ ভ্রমণ'—জাতীয় ভ্রমণ কাহিনি লিখব। অল্প দিনের মধ্যেই মাথা থেকে এই চিন্তা ঝেড়ে ফেললাম। কারণ আমার ব্যক্তিগত কাহিনি কী করলাম, কোথায় থাকলাম, কী খেলাম ইত্যাদির চাইতে অ্যানা কাহিনি জানানো অনেক বেশি জরুরি। অনেকেই তাঁর ডায়েরি পড়লেও সেই-ব্যক্তি মানুষটাকে কমই চেনেন বা জানেন।

অ্যানা-আইকন সৃষ্টির মূলে পটভূমিকাটা কী? যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হত, যদি নাৎসিরা ইহুদিদের চরম নিপীড়ন না করত অথবা যদি অ্যানা যুদ্ধশেষে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসত তাহলে কি অ্যানা নিজস্ব প্রতিভার জোরে বিশ্বপরিচিতি লাভ করত? এক কথায় উত্তর, না। অ্যানা খুব বেশি-হলে সাহিত্যিক বা সাংবাদিক হত যার ব্যপ্তি অতি ক্ষুদ্র গণ্ডি।

আজ শুধু অ্যানা বা সঙ্গী-সাথীদের উপর ইংরেজি ও ডাচ ভাষা মিশিয়ে বই এর সংখ্যা দু-শ ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য ভাষায় তাঁকে কেন্দ্র করে কত বই লেখা হয়েছে তার হিসাব পাওয়া কঠিন। তাঁর সামান্যতম সংস্পর্শে এসেও কত মানুষ যে খ্যাত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তা সে সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই হোক না কেন। ডাটম্যান-কে কে চিনত? হাজার-হাজার নাৎসি অফিসারদের একজন। কিন্তু অ্যানাদের গুপ্তমহল থেকে ধরে আনার হুকুম দেওয়ার জন্যেই মানুষ তাকে মনে রেখেছে। ঘৃণার সাথে হলেও।

লিখতে গিয়ে দেখেছি অ্যানাকে ঘিরে ধরা চরিত্রের সংখ্যা অনেক। আমি কেবলমাত্র যারা অ্যানার অতি-নিকট, তাদের কথাই বলেছি। গুপ্তমহলের অ্যানা সহ আট বাসিন্দা ও তাঁদের সাহায্যকারী অবশ্যই এই দলে। আর শৈশবের বান্ধবী যারা জন্মদিনে আমন্ত্রিত। আর প্রাসঙ্গিক দু-চার জন। সবার কথা বললে বই-এর কলেবর অনাবশ্যক বৃদ্ধি পেত।

'আমি অ্যানাকে জানি'-এই দাবি নিয়ে অনেকেই যুদ্ধ-পরবর্তীকালে মিডিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের বাদ দেওয়া, কল্পনা-ভিত্তিক কাহিনি রচনা করা ইত্যাদি কারণে বহু কাঁটছাঁট করে আমার মতে যেটুকু নির্ভুল তথ্য সেটুকুই পাঠককে জানানোর চেষ্টা করেছি। কল্পনা-আশ্রিত ঘটনা সংযোজন করে অনাবশ্যক মেদবহুল করার চেয়ে কৃশ, মেদহীন করা শ্রেয় বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

সম্পূর্ণ যে বাদ দিতে পেরেছি সে দাবি করব না। কারণ অ্যানা সম্পর্কে বহু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনোদিনও জানা যাবে না ঠিক কার বিশ্বাসঘাতকতায় গুপ্তমহলের বাসিন্দারা ধরা পড়েছিল। অ্যানা-মারগট-পিটারের মৃত্যু ঠিক কবে, কীভাবে হয়েছিল। শেষ দিনগুলির প্রত্যক্ষদর্শীর অনেক দাবিদার। কোনটা সত্যি, আর কোনটা অনৃত ভাষণ পার্থক্য করা কঠিন। তবে সব টুকরো ছবির কোলাজ করলে একটা অস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে, তারই আভাস দিয়েছি।

পুরো ঘটনা যেহেতু হল্যান্ড-জার্মান-পোল্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই যেখানে সঠিক প্রতিশব্দ খুঁজে পাইনি সেখানে পাঠকের সুবিধার্থে মূল শব্দটিকে উল্লেখ করেছি। অ্যানা প্রসঙ্গে বারবার এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। যুদ্ধের সমকালীন পরিস্থিতি না জানলে অ্যানাদের মানসিক অবস্থা, নাৎসিদের উদ্বেগ ও কাজের মধ্যে তার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। যুদ্ধ তখন অন্তিম লগ্নে। চারিদিকে পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘটনাবহুল। তাঁরই আঁচ পড়েছে অ্যানা-কাহিনিতে।

অ্যানা ফ্রাঙ্কের ক্ষুদ্র জীবনের আরও ক্ষুদ্র প্রায় আবছা আলো-অন্ধকারে ঢাকা জীবনকে জানানোর এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠক সাদরে গ্রহণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সেটা ১৯৮২ সাল। বইমেলা থেকে অনেকগুলো বই-এর সাথে কিনে ফেললাম একটা মাঝারি আকারের বই, আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি। ইংরেজিতে লেখা ডায়েরি অব অ্যা ইয়ং গার্ল থেকে অনুবাদ আমার প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম গোটা বই। কোন গল্প উপন্যাস নয়। মাত্র এগারো বছর বয়সের এক সদ্য কিশোরীর দিনলিপি। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রাণবন্ত ঝরঝরে ভাষা। ওই বয়সে আর পাঁচটা মেয়ের যা হয় সেই চপলতা, বন্ধুদের সাথে খুনসুটি সবই ঠাঁই পেয়েছে দিনলিপিতে। তারই মাঝে নিপুণ কলমের আঁচড়ে উঠে এসেছে নাৎসিদের ভয়ে লুকিয়ে থাকা দুবছর দুমাসের জীবন-যন্ত্রণার ছবি। হলোকাস্টে ষাট লক্ষের বেশি ইহুদি প্রাণ দিয়েছে। অ্যানা তাঁদেরই একজন। কিন্তু অসংখ্য মানুষের ভীড়ে না হারিয়ে যেন তাঁদেরই মুখ হয়ে উঠেছে।

অ্যানার ডায়েরি পড়ার পর থেকেই আমি তাঁর অনুরাগী। সেই ২৬৩ প্রিন্সেন গ্রাচ্ট-এর গুপ্তমহল যেখানে অ্যানা দীর্ঘকাল তার পরিবারের সাথে আত্মগোপন করে ছিল। যেখান থেকে ধরা পড়ার পরে তাঁকে যেতে হয়েছিল বন্দিশিবিরে, তা আমার কাছে জেরুজালেম, মক্কার সাথে তুলনীয়। স্বপ্নে দেখতাম আমি সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছি। স্বপ্ন একদিন বাস্তব হল। পাড়ি দিলাম নেদারল্যান্ডে। বেশ কিছুদিনের জন্য। ঘাঁটি আমস্টারডামে। ফলে সাইকেলে সিনজেল ক্যানেলের সেই প্রথম আপিস ঘর, গুপ্তমহল, মেরওয়েদে প্লেন, মন্তেসরি কিন্ডার গার্ডেন যা আজ অ্যানা ফ্রাঙ্ক স্কুল, অয়টারপেস্ট্রাট, ওয়েটারিংশ্চ্যান্স, জাওলে, অ্যামস্টিলভিল্গেগ, আমার্সফুর্ত ইত্যাদি সবই আওতার মধ্যে। আর ট্রেনপথে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সাইকেলে ঘুরেছি আখেন,

ওয়েস্টারবর্ক, বেরগেন-বেলসেন, নুয়েনগামে ইত্যাদি। আমার এই দীর্ঘপথ পরিক্রমা শুধু অ্যানার সন্ধানে। সেই ভয়ানক দিনগুলিকে আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করার জন্য। আমার এই উৎসাহের পিছনে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর সেই অনুবাদ। তাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে ঋণী তাঁর কাছে।

কবি তাঁর অনুবাদে 'আনা' লিখলেও আমি 'অ্যানা' লিখেছি। কারণ তাঁর প্রকৃত নাম 'Annelies', মা-বাবার কাছে শুধু 'Anne'। ডাচ ভাষায় উচ্চারণ 'অ্যানে'। তার সাথে সাযুজ্য রেখে বাংলায় 'অ্যানা'। তবে বিদেশি নামের উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য থাকতেই পারে। এই সমস্যা অন্যান্য অনেক চরিত্রের ক্ষেত্রেই হয়েছে।

তবে কিছু বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। যেমন ২৪ জুনের ডায়েরির পাতায় যাকে হ্যারী গোল্ডবার্গ বলা হয়েছে তাঁর প্রকৃত নাম Helmuth (Hello) Silberberg। অ্যানা তাঁর ডায়েরি নতুন করে লেখার সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যাকির নাম লেখেন Jopie বা য়োপি। ডায়েরির কিটি কোনো কাল্পনিক নাম নয়, তাঁরই শৈশবের বান্ধবী। যে পরে যুদ্ধেশেষে থেরেসিনস্ট্যাড থেকে ফিরে স্বাভাবিক জীবন শুরু করে। ২৭ নভেম্বর '৪৩ লিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে চিঠি লেখে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ লিস দুজন। একজন সানে বারবারার মা, অন্যজন লিস ওয়াগনার। চিঠিটা এঁদের কাউকে লেখা নয়। অনেকের মতে জ্যাকি-কে লেখা।

তবে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কবি অনুবাদ করেছেন তা একশো ভাগ সাফল্য পেয়েছে। বাঙালির হৃদয়ে অ্যানা স্থান করে নিয়েছে স্থায়ীভাবে।

অ্যানা যে কল্প-চরিত্র থেকে উঠে আসা কোনো নাম নয়, রক্ত-মাংসে গড়া অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে, ছোটো হলেও তারও একটা জীবন আছে তা সবার কাছে তুলে ধরার জন্য আমার এই প্রয়াস। তাঁর শৈশব-কৈশোর, বিশেষত বহু বিতর্কিত গাঢ় কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া তাঁর শেষ দিনগুলিকে তুলনায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি তা পাঠকই বলবে।

আমি আনন্দিত এবং সেই সাথে গৌরববোধ করছি অচেনা অ্যানার সাথে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি' সংযোজিত করতে পেরে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে অ্যানাকে চেনা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হবে। যার অনুবাদ পড়ে অন্যান্যদের মতো আমিও অ্যানাকে আপন করে নিতে পেরেছি তার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বিশেষত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ সালে কৃষ্ণনগরে জন্ম নেওয়া কবির এটা শতবর্ষ চলছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন রকম ভাবে এই মহান কবিকে স্মরণ করছে। আমিও আমার বই-এর সাথে তাঁর বইটিকে সংযোজিত করে আবার পাঠকের দরবারে হাজির করে তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম, আনত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

॥ আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি ॥

॥ রয়ে গেছে, রয়েই যাবে ॥

ঠিক তেরো বছর বয়েসে ডায়েরি লিখতে শুরু করেছিল এক সদ্যকিশোরী। তারপর দু বছর দু মাস। পনেরো বছর দু মাস বয়সি কিশোরী শেষ আঁচড় টেনেছিল ডায়েরির পাতায়। তার ঠিক সাত মাস পরে এই পৃথিবীর জল-মাটি-হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল সেই কিশোরীর। অথবা হয়নি। রয়ে গেছে। রয়েই যাবে।

সেই কিশোরীর সেই ডায়েরি, দু বছর দু মাসের দিনলিপি—আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি।

বাবার নাম অটো ফ্রাঙ্ক, মায়ের নাম এডিথ। জার্মানির বাসিন্দা তাঁরা, ধর্মে ইহুদি। অটো-এডিথের প্রথম সন্তান মারগট, জন্ম তার ১৯২৬ সালে। দ্বিতীয় সন্তান আনা, আনা ফ্রাঙ্ক, জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ জুন।

ঠিক তখনই জার্মানির মাটিতে মাথা তুলছে হিটলার, সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে তার নাৎসি বাহিনী। ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে তারা। অনেক ইহুদিই জার্মানির পাট চুকিয়ে চলে যাচ্ছেন অন্য কোনো দেশে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ১৯৩৩ সালে দেশ ছাড়লেন অটো ফ্রাঙ্কও। চলে গেলেন হল্যান্ডে। আনা ফ্রাঙ্ক তখন চার বছরের শিশু।

তার ছ'বছর পর শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবী দখলের স্বপ্ন দেখছে হিটলার। জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনকে, কারণ তিনি ইহুদি। হল্যান্ডের আলো-হাওয়ায় বড়ো হচ্ছে আনা ফ্রাঙ্ক।

হল্যান্ডের নিরাপদ আশ্রয়ও আর নিরাপদ রইল না। ১৯৪১ সালে হিটলারের নাৎসিবাহিনী হল্যান্ড দখল করল। শুরু হল ইহুদিদের ওপর অত্যাচার। অসংখ্য ইহুদিকে পাঠানো হল বন্দিশিবিরে। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে শমন এল অটো ফ্রাঙ্কের নামে। অর্থাৎ-হাতছানি দিল বন্দিশিবির। সে-ডাকে সাড়া দিলেন না অটো ফ্রাঙ্ক। নিজেদের অফিস-বাড়ির পেছনদিকে এক গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিলেন সপরিবারে। সঙ্গে রইল আর-একটি পরিবার। সাহায্য করলেন কয়েকজন বন্ধু। আনা ফ্রাঙ্ক তখন তেরো বছর এক মাসের সদ্যকিশোরী।

তারপর পঁচিশটা মাস। পঁচিশ মাস পর, ১৯৪৪ সালের ৪ আগস্ট, গোপন আস্তানায় হানা দিয়েছিল নাৎসিবাহিনী, আটজন 'ইহুদি' মানুষকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বন্দিশিবিরে। জার্মানির আউশভিৎস্ বন্দিশিবিরে ১৯৪৫ সালের ৬

জানুয়ারি মারা যান আনার মা। মারগট আর আনাকে পাঠানো হয় আরও দূরবর্তী বেরজেন-বেল্‌সেন বন্দিশিবিরে। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারির শেষদিকে অথবা মার্চের শুরুতে সেখানেই মারা যায় মারগট। আর মার্চ মাসেই, ওই বন্দিশিবিরেই, শেষবারের মতো চোখ বুজেছিল পনেরো বছর ন মাসের সেই কিশোরী—আনা ফ্রাঙ্ক।

বন্দিশিবির থেকে ফিরতে পারেননি ফান ডান পরিবারের তিনজন সদস্য এবং ডাঃ ডুসেল-ও। মৃত্যুর অন্ধকার থেকে ফিরে এসেছিলেন শুধু একজন : অটো ফ্রাঙ্ক। আর তখনই তাঁদের দুই শুভার্থী, এলি আর মিপ, তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন লাল ডোরাকাটা মলাটের একটা ডায়েরি এবং আরও কিছু কাগজ—আনার লেখা। আনার দিনলিপি। আনার গল্প উপন্যাস—স্মৃতিকথা।

প্রকাশিত হয়েছিল সেই দিনলিপি—এই 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি'। তারপর ইতিহাস। এক সদ্যকিশোরীর দিনলিপি অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায়, তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র, মঞ্চস্থ হয়েছে নাটক।

এই ডায়েরিতে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে সত্যিই-কিশোরী আনাকে, পরক্ষণেই পাঠককে বিস্মিত করে সামনে এসে দাঁড়াবে আশ্চর্য-গভীর আনা ফ্রাঙ্ক। দৈনন্দিন বর্ণনার পাশাপাশি তেরো থেকে পনেরোর দিকে হেঁটে-চলা কিশোরী অনায়াসে কথা বলে গেছে দর্শন, ঈশ্বর, মানবচরিত্র নিয়ে, প্রেম-প্রকৃতি-জীবনবোধ নিয়ে। সেইসঙ্গেই ফুটে উঠেছে সমকালীন ইতিহাস, ইহুদিদের লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা-সংগ্রাম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছবি।

লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখত আনা, স্বপ্ন দেখত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার। বেঁচে থাকলে আজ তার বয়েস হত সত্তর বছর। সে বেঁচে নেই। ঝরে গেছে কুঁড়িতেই।

অথবা ঝরেনি, ঝরে না। অনেক অনেক সত্তর পেরিয়েও, বেঁচে থাকে তারা—স্রষ্টারা। বেঁচে আছে আনা, মৃত্যুর পরেও, কারণ বেঁচে আছে তার দিনলিপি, আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি—যার মৃত্যু নেই।

রবিবার, জুন ১৪, ১৯৪২

শুক্রবার, ১২ই জুন, ছ টায় আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং এখন আমি জানি কেন—সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। তবে অত ভোরে ওঠা অবশ্যই আমার বারণ, সুতরাং ভেতরে ভেতরে ছটফট করলেও পৌনে সাতটা অব্দি নিজেকে সামলে রাখতে হল। ব্যস, তারপর আর নিজেকে ধরে রাখা গেল না। উঠে আমি খাওয়ার ঘরে চলে গেলাম। সেখানে মুরটিয়ে (বেড়াল) আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

সাতটা বাজার খানিক পরেই আমি চলে গেলাম মা-বাবার কাছে। তারপর বৈঠকখানায় গিয়ে উপহারের প্যাকেটগুলো খুলতে লাগলাম। প্রথমেই যে স্বাগত জানাল সে হলে তুমি, সম্ভবত সেটাই হয়েছে আমার সবচেয়ে সেরা জিনিস। এছাড়া টেবিলে একগুচ্ছ গোলাপ, একটা চারা গাছ, আর কিছু পেওনিফুল, সারাদিনের মধ্যে আরও কিছু এসে গেল।

মা-বাবার কাছ থেকে পেলাম একরাশ জিনিস, আর নানা বন্ধুতে আমার মাথাটা সম্পূর্ণ খেল। আর যা যা পেলাম, তার মধ্যে ছিল ক্যামেরা অব্‌স্কুরা, একটা পার্টি গেম্, প্রচুর লজেন্স, চকোলেট, একটি গোলকধাঁধা, একটা ব্রোচ, জোসেফ কোহেনের লেখা 'নেদারল্যান্ডস্-এর লোককথা আর পৌরাণিক উপাখ্যান', 'ডেইজি-র ছুটিতে পাহাড়ে' (দারুণ একখানা বই), আর কিছু টাকাকড়ি। এইবার আমি কিন্তু কিনতে পারব 'গ্রিস আর রোমের উপকথা'—তোফা।

তারপর লিস বাড়িতে এল ডাকতে, আমরা ইস্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় সবাইকে আমি মিষ্টি বিস্কুট দিলাম, তারপর আবার আমাদের মন দিতে হল ইস্কুলের পড়ায়।

এবার ইতি টানতে হবে। আসি ভাই, আমরা হব হলায়-গলায় বন্ধু!

সোমবার, জুন ১৫, ১৯৪২

আমার জন্মদিনে পার্টি হল রবিবার বিকেলে। আমরা একটা ফিল্ম দেখালাম : 'বাতিঘর রক্ষক', তাতে রিন-টিন-টিন ছিল। আমার ইস্কুলের বন্ধুরা ছবিটা চুটিয়ে উপভোগ করেছে। আমাদের সময়টা খুব ভালো কেটেছিল। ছেলেমেয়ে ছিল প্রচুর। আমার মা-মণির সবসময় খুব জানার ইচ্ছে কাকে আমি বিয়ে করব। তাঁর কতকটা আন্দাজ, পিটার ভেসেল্ হল সেই ছেলে; একদিন লজ্জায় লাল না হয়ে কিংবা চোখের একটি পাতাও না কাঁপিয়ে মা-মণির মন থেকে সরাসরি ওই ধারণাটা যো-সো

করে ঘোচাতে পেরেছিলাম। বছর কয়েক ধরে, আমার প্রাণের বন্ধু বলতে লিস্ গুসেন্স্ আর সানা হুটমান। এরপর ইহুদিদের মাধ্যমিক ইস্কুলে য়োপি দ্য ভালের সঙ্গে আমার আলাপ; প্রায়ই আমরা একসঙ্গে কাটাই; আমার মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে ওর সঙ্গেই এখন আমার সবচেয়ে বেশি ভাব। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে লিসের বেশি বন্ধুত্ব; আর সানা যায় অন্য একটা ইস্কুলে—সেখানে তার নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে।

শনিবার, জুন ২০, ১৯৪২

দিন কয়েক আমি লিখিনি, তার কারণ আমি সবার আগে চেয়েছিলাম ডায়রিটা নিয়ে ভাবতে। আমার মতো একজনের পক্ষে ডায়েরি রাখার চিন্তাটা বেখাপ্পা; আগে কখনও ডায়েরি রাখিনি বলে শুধু নয়, আসলে আমার মনে হয়, তেরো বছরের এক স্কুলের মেয়ের মনখোলা কথাবার্তা কোনো আগ্রহ জাগাবে না—না আমার, না সেদিক থেকে আর কারও। তা হোক, কী আসে যায় তাতে? আমি চাই লিখতে কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল, আমার বুকের গভীরে যা কিছু চাপা পড়ে রয়েছে আমি চাই সেসব বার করে আনতে।

লোকে কথায় বলে, 'মানুষের চেয়ে কাগজে সয় বেশি'; যে দিনগুলোতে আমার মন একটু ভার হয়ে থাকে, সেই রকম একটা দিনে—গালে হাত দিয়ে আমি বসে আছি। মনটা ভীষণ বেজার, এমন একটা নেতিয়ে-পড়া ভাব যে ঘরে থাকব, না বেরিয়ে পড়ব সেটা পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারছি না—কথাটা ঠিক তখনই আমার মনে এল। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, কাগজের আছে সহ্যগুণ এবং এই শক্ত মলাট দেওয়া নোটবই, জাঁক করে যার নাম রাখা হয়েছে 'ডায়রি', সত্যিকার কোনো ছেলে বা মেয়ে বন্ধু না পেলে কাউকেই আমি দেখাতে যাচ্ছি না—কাজেই মনে হয় তাতে কারও কিছু আসে যায় না। এবার আদত ব্যাপারটাতে আসা যাক, কেন আমি ডায়রি শুরু করছি তার কারণটা : এর কারণ হল আমার তেমন সত্যিকার কোনো বন্ধু নেই।

কথাটা আর-একটু খোলসা করে বলা যাক, কেননা তেরো বছরের একটি মেয়ে দুনিয়ায় নিজেকে একেবারে একা বলে মনে করে, এটা কারও বিশ্বাস হবে না, তাছাড়া তা নয়ও। আমার আছে খুব আদরের মা-বাবা আর ষোলো বছরের এক দিদি। আমার চেনা প্রায় তিরিশজন আছে যাদের বন্ধু বলা যেতে পারে—আমার একগোছা ছেলে-বন্ধু আছে, যারা আমাকে এক ঝলক দেখবে বলে উদ্‌গ্রীব এবং না পারলে, ক্লাসের আয়নাগুলোতে আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। আমার আত্মীয়স্বজনেরা আছে, মাসি-পিসি কাকা-মামার দল, তারা আমার ইষ্টিকুটুম; আর রয়েছে একটা সুখের সংসার, না—আমার কোনো অভাব আছে বলে মনে হয় না। তবে আমার সব বন্ধুরই সেই এক ব্যাপার, কেবল হাসিতামাসা আর ঠাট্টাইয়ার্কি, তার বেশি কিছু নয়। মামুলি বিষয়ের বাইরে কোনো কথা বলা যায় না। আমরা কেমন যেন কিছুতেই সেরকম ঘনিষ্ঠ হতে পারি না—আসল মুশকিল সেইখানে। হতে পারে আমার

আত্মবিশ্বাসের অভাব, কিন্তু সে যাই হোক, ঘটনাটা অস্বীকার করা যায় না এবং এ নিয়ে আমার কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।

সেই কারণেই, এই ডায়রি। যে বন্ধুটির আশায় এতদিন আমি পথ চেয়ে বসেছিলাম তার ছবিটা আমার মানসপটে বড়ো করে ফোটাতেও চাই; আমি তাই অধিকাংশ লোকের মতন আমার ডায়রিতে একের পর এক নিছক ন্যাড়া ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে দিতে চাই না; তার বদলে আমি চাই এই ডায়রিটা হোক আমার বন্ধু; আমার সেই বন্ধুকে আমি কিটি বলে ডাকব। কিটিকে লেখা আমার চিঠিগুলো যদি হঠাৎ দুম্ করে শুরু করে দিই তাহলে আমি কী বলছি কেউ বুঝবে না; সেইজন্যে আরম্ভে খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা আঁচড়ে আমার জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলব।

মাকে যখন বিয়ে করেন তখন আমার বাবার বয়স ছত্রিশ আর মার বয়স পঁচিশ। আমার দিদি মারগট হয় ১৯২৬ সালে ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মাইন শহরে, তারপর হই আমি—১৯২৯-এর ১২ জুন। আমরা ইহুদি বলে ১৯৩৩ সালে আমরা হল্যান্ডে চলে যাই, সেখানে আমার বাবা ট্রাভিস্ এন. ভি.-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। যে কোলেন অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার আপিস একই বাড়িতে—আমার বাবা তার পার্টনার।

আমাদের পরিবারের বাকি সবাইয়ের ওপর অবশ্য হিটলারের ইহুদি বিরোধী বিধিবাঁধনের পুরো চোট এসে পড়েছে, কাজেই জীবন ছিল দুর্ভাবনায় ভরা। যে সময়টা ইহুদিদের দ্যাখ্-মার করা হয়, তার ঠিক পরে ১৯৩৮ সালে আমার দুই মামা পালিয়ে আমেরিকায় চলে যান। আমার বুড়ি-দিদিমা আমাদের কাছে চলে আসেন, তাঁর বয়স তখন তিয়াত্তর। ১৯৪০ সালের মে মাসের পর দেখতে দেখতে সুদিন উধাও হতে থাকে : প্রথমে তো যুদ্ধ, তারপর আত্মসমর্পণ, আর তারপরই জার্মানদের পদার্পণ; ওরা পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহুদিদের লাঞ্ছনা দস্তুরমত শুরু হয়ে গেল। দ্রুত পর্যায়ে একের পর এক ইহুদিবিরোধী ফরমান জারি হতে লাগল। ইহুদিদের অবশ্যই হল্‌দে তারা* পরতে হবে, ইহুদিদের সাইকেলগুলো অবশ্যই জমা দিতে হবে, রেলগাড়িতে ইহুদিদের চড়া নিষিদ্ধ এবং গাড়ি চালানোও তাদের বারণ। কেবল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ইহুদিরা সওদা করতে পারবে এবং তাও একমাত্র 'ইহুদিদের দোকান' বলে প্ল্যাকার্ড-মারা দোকানে। আটটার মধ্যে ফিরে ইহুদিদের ঘরে আটক থাকতে হবে। ওই সময়ের পর এমন কি নিজের বাড়ির বাগানেও বসা চলবে না। থিয়েটার, সিনেমা এবং অন্যান্য আমোদ-প্রামোদের জায়গায় ইহুদিরা যেতে পারবে না। সাধারণের খেলাধুলোয় ইহুদিরা যেন যোগ না দেয়। সাঁতারের জায়গা,

---

* যাতে আলাদাভাবে তাদের চেনা যায় সেইজন্যে জার্মানরা সমস্ত ইহুদিকে একটি করে ছ-মুখো তারা সকলের চোখে পড়ার মতো করে পরতে বাধ্য করেছিল।